আড্ডার নেশা থেকে নেশার আড্ডায়
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

ইস্কুল-কলেজে তেমন করে যাওয়া হয়নি বলেই হয়ত অনেক ছোটবেলা থেকেই আড্ডাবাজদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলি। অফুরন্ত সময় ছিল নিজেকে নানাবিধ আড্ডার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। তার মধ্যে যেমন রাজনীতির আড্ডা ছিল, তেমনই ছিল লেখকদের আড্ডা, পাড়ার নাট্যকর্মীদের আড্ডা। তবে সেকালে পাড়ার আড্ডায় আমার মন ছিল না। মন ছিল না ক্লাব কিম্বা পুজোয়। অন্য দিকে নিজের জীবনকে যথেচ্ছ যাপন করার মন্তর-টন্তর কানে বিঁধে গেছে। ফলে খোলা আড্ডার আড়ালে বিস্তর ঠেকবাজিতে নিজেকে বখাটে করেছি। প্রতিটি আড্ডারই রকমফের আছে সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমার 'বাওয়াল' জীবনের নানা বাঁকে, নানা ঘটনা - দুর্ঘটনায় আড্ডামুখর বেলা - অবেলাগুলো ক্রমাগত রং পাল্টেছে। কিন্তু আড্ডাধারী হিসেবে এখনও নিজেকে সেভাবে মাপতে পারিনি।

যা লিখতে চাইছি, তা ঠেক থেকে ঠেকান্তরে, আড্ডাবাজ থেকে আড্ডাধারীর মধ্যে এমন মিলে চলা, তাল-বেতালের সঙ্গ করা। আসলে সকলেই চলে নিজের তালে। কিন্তু যখন কেউ আড্ডা মারছে বা যেখানে আড্ডা চলছে তার চেহারাটির মধ্যে একটা যৌথতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তা প্রকৃতই মনকে ছুঁয়ে যায়, আনন্দে ভরে যায়। অর্থাৎ আড্ডাবাজ যেমন নিজস্বতার একটা পর্যায় ছেড়ে এসে নিজেকে সবার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় তেমন যে - কোনও আড্ডাস্থলেরই নিজস্ব একটা চরিত্র থাকে যা স্বভাবতই অন্যটির থেকে আলাদা, মানে নানা ধরণের মানুষ, নানা মাপের মানুষ, নানা মনোভাবের মানুষের সে এক আশ্চর্য মিলমিশ। তার মধ্যেই আবার বিরোধ আর তর্কবিতর্ক, ধাক্কাধাক্কি। আর সেক্ষেত্রে আমার সকাল-সন্ধে কিংবা দুপুররাতের আড্ডা ছিল খন্ড-বৈচিত্র্যের সমাহার। সেই অসাধারণ সব সুযোগ আমি অনেক কম বয়সেই পেয়ে যাই। কারণ গড্ডলিকার বাইরে বলে গর্ববোধ করলেও বেসিক্যালি ছিলাম, মারাত্মক - যাকে বলে ডেঁপো। বলা বাহুল্য, কম বয়সে সব সময়ই প্রায় আড্ডা দিয়েছি, দল বেঁধেছি আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে। তবে হ্যাঁ, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব দলবাজি আর আড্ডায় সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি বহু কমবয়সি ছেলেমেয়েদের। এমন কি অভিভাবকদের কাছে এও শুনতে হয়েছে যে, 'মাথা খাচ্ছে।' তাতে আমাদের আড্ডার তেমন কোনও আতান্তর ঘটেনি। বয়স্করা আমাদের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে আজও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। যাই হোক, সেসব গেল অন্য কথা...

এখানে আরেকটি কথা না পাড়লে বিষয়ের চরিত্রটা ঠিক ফুটে উঠবে না— তা হল আমার বাড়ি অর্থাৎ পরিবারের লোকজন আদ্যোপান্ত বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বলে বাড়িটা ছিল চমৎকার একটি আড্ডার শ্রীক্ষেত্র। আর সেখানে মধ্যমণি ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। সে সময় ষাট-সত্তরের দশকে নাগরিক বামপন্থায় 'আড্ডা' অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকতো। আর সেইসব রাজনৈতিক, পারিবারিক আড্ডায় ঢুকে পড়ত নানা ভবঘুরে, লেখক, শিল্পী, চোর, মাতাল কিংবা গায়ক। তবে বক্কিবাজি যেমন আড্ডার চালিকাশক্তি তেমনই গানবাজনার কদরও সব সময় দেখা গেছে। আমার ছেলেবেলা কেটেছে কখনও-কখনও মাঝরাত্তিরে বাউলাশ্রিত আড্ডার উদাত্ত সুরে। তার একটা চূড়ান্তরূপ দেখেছিলাম পুর্ণদাস বাউল ও শ্রীমতি মঞ্জুদেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে আমাদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে অহোরাত্রি আড্ডার সুরছন্দে। পরে, অনেক পরে বাউল আমার বিষয় হয়েছে, মেলাখেলা অন্তরঙ্গ হয়েছে, বাউল আর নেশাকে একই বাক্যবন্ধে অন্যভাবে, অন্যরূপে সনাক্ত করেছি আমার জীবনকে যথেচ্ছ যাপনের মধ্য দিয়ে।

যে আড্ডায় প্রথম ঢুকবো তা হল নেশাতুর গালিঘুঁজি থেকে মেলা-মোচ্ছবের আড্ডায়। তার রং, তার বিস্তার, তার নাটকীয়তা, তার পরিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়পড়তা আড্ডাকে টক্কর দিয়েছে। আসলে দস্তয়েফস্কি দু-চার পাতা পড়ে ফেলার দরুন নিজেকে নেশাভাঙে আড্ডায় নিয়োজিত করতে অসুবিধা হয়নি। নিজেকে সাংস্কৃতিক কর্মীই বলি বা লেখকই বলি তাঁর সঙ্গে একআধটু গাঁজা-মদ মেলাতে না পালে ঠিক 'ক্রিয়েটিভ' থাকা যায় না, এমন ধারণা তখন শুধু নয় এখনও বেশ চলতি।

প্রকৃতপক্ষে নেশাভাঙের মৌতাতে সব সময় যে সংস্কৃতিক পাঠ হয়েছে তা নয়। নিজের নিজের অন্বেষণ ও সন্ধানের কারণেই অনেককে সেইসবই নেশাতুর নীলরাতে লাইটপোস্টের মরা আলোয় চোরচোট্টা পকেটমার কিম্বা খুরবাজ ব্ল্যাকারদের মিলিয়ে নিতে হয়েছে। যেমন, একটা দুর্দান্ত আড্ডা ছিল হাড়কাটা গলির মাঝখানে একটি বাড়ির ছাদে। চিত্রকর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহুবার গেছি এই চতুর্দিকে যৌনকর্মী সংলগ্ন হয়ে কীভাবে তিনি এখানে আড্ডা সাজাতেন তার স্বাদ নিতে। প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সম্ভবত এই আড্ডাটা ঘটে উঠতো। দুপুর গড়িয়ে গেলেই শুরু হত আর চলত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। অফুরন্ত বাংলা মদ আর সঙ্গে 'টুকস অ্যান্ড টাকস'।

আড্ডার বিষয় হিসেবে অকাতরে চলে আসতো পুলিশ লক-আপের অভিজ্ঞতা, গণিকাপল্লীর হালচাল থেকে নানা নেশার হরকে দৌড় আর কবিতা আর ঋত্বিক থেকে জ্যঁ জেনে। এ পিম্পকে মদ ঢালতে-ঢালতে বলতে শুনেছি, 'দাদা, ওই কবির গল্পটা বলুন না, যে পুলিশের জামার মধ্যে মাল খেয়ে বমি করেছিল!' আড্ডায় তো আর সকলেই কথা বলে না। তবে যারা শোনে তারা কে কী বোঝে তার কোনও সরল অঙ্ক এখানে করা যাবে না। কেননা যে কোনও আড্ডাই তো আর সকলেই কথা বলে না। আড্ডাবাজদের জন্য স্বাধীন এক উড়ানক্ষেত্র। তাঁকে উড়তে জানতে হবে। জলজ নেশার ঠেকবাজদের তেমন না হলেও গাঁজা-চরসের আড্ডায় তো হাঁকই পাড়া হয় 'উড় উড় খ্যাপাচাদনিওয়ালা চৌরাস্তা...।' খালাসিটোলা বারদুয়ারির মাতাল আড্ডায় বহু কবি লেখক শিল্পীকে দেখেছি নিজের আড্ডা থেকে কখন টুক করে বেরিয়ে ঠেলাচালক, রিক্সাচালক কিংবা লেদমেশিনের শ্রমিকদের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে অন্যতর আড্ডায় মশগুল হয়ে যেতে। যে যার ভাষায় অনবরত কথালাপ চালিয়ে যাচ্ছে অথচ এবোরে মেরুপ্রমাণ পার্থক্যে রয়েছে দু-দলের সংস্কৃতি, বোধ, বুদ্ধি, বিচার। তাতে আড্ডার চড়া সুরে কোনও খেদ পড়েনি।

সাবেকি বাবু-সংস্কৃতির আড্ডায় যেমন চাতেলেভাজাআদৃত ছিল (আজও তা মিলিয়ে যায়নি) তেমন এই সব আড্ডায় নানা বয়সের নেশাড়ুরা কেমন দিব্যি ঘন্টার পর ঘন্টা কথালাপে কাটিয়ে দেয়, যোগানও জুটে যায়। ওই যে বলে নেশার পয়সা ভূতে জোগায়। তবে তরল

নেশার আড্ডা আর ধুম্রপায়ীদের আড্ডায় মিল খোঁজা ভার। মনে পড়ে একসময় ছিল পার্ক লেনে ববের আড্ডা। দেদার চরস পুড়ছে। ব্যাটারির বাক্স উল্টে নিয়ে আমরা বসতাম। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা বয়সের মানুষ, নেশাতাড়িত মানুষ মগ্ন হয়ে সঙ্গ করছে। এখানে বহুবার বা বলা যায় প্রায়ই যেতাম। তবে নিজেকে খুব সমৃদ্ধ মনে হতে যদি সঙ্গে থাকতেন কবি দীপক মজুমদার। দীপকদা মদ্যপানে খানিক উচ্চকিত, কিঞ্চিত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যেতেন। কিন্তু গাঁজা-চরসে তিনি ছিলেন সাবলীল এক ম্যারাথন টকার। আর ইতিহাসের আগুপিছুতে, ঘটনার শুরুশেষে, বিষয়ের উৎসবিস্তারের সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁর বাচনভঙ্গীতে ছিল আকুল হনেশার উপক্রমণিকা। বব দীপকদাকে শ্রদ্ধা করতো, এমন কি পয়সা না থকালেও চরসের দানা দিয়ে ঠায় বসে থাকত বব। কী বুঝতো? হয়তো দীপকদার শরীরছন্দের ভাষাই মোহিত রাখতো!

একটা সময় আমি টানা গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থাকতাম। আমি তখন ওঁর সহকারী। দীপকদাও থাকতেন। নিত্যরাত আমাদের কাজ ছিল তামাক খাওয়া, যা আমাকেই বানাতে হত, নানাবিধ বিষয়ে আড্ডা মারা, আর টেপ রেকর্ডারে দীপক মজুমদারের কথা রেকর্ড করা। আর তার বিষয় হেসসেক্সি থেকে সাহারা, কৌম জীবনযাত্রা থেকে সিনেমা, কবিতা থেকে নাটক আর রাজনীতি থেকে নেশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আড্ডা মারার ফাঁকতালে আমাদের কাজ ছিল দীপকদাকে উসকে দেওয়া আর তাঁর জীবনচারী অভিজ্ঞতার পাঠ নেওয়া।

আসলে আমাদের আড্ডাতন্ত্রে ছিল অ্যাকটিভ এক অনুষ্ঠানমুখরতা। আড্ডা মারতে মারতে নানা কাজ, জড়ো হওয়া, জড়ো করার ফন্দিফিকির। সমমনোভাবের মানুষদের এককাট্টা করে তৈরি করতাম আরোগ্যসম্ভব অনুষ্ঠান সব। একসময় নয়-নয় করে প্রায় বছর দশ - বারো কলেজ স্ট্রীটে ছিল আমাদের নিত্য যাওয়া আসা। একটি ফুটপাতের চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে ছিল আমাদের আড্ডা। ক্রমে উল্টো ফুটপাতের একটা কিয়স্ক জোগাড় করে তৈরি হয় 'কাগজের বাঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী পত্র-পত্রিকার দোকান। লেখা পড়া, গান গাওয়া, গান শোনা, আলোচনা, তর্কবিতর্ক — তখনকার পিয়ারীচরণ সরকার স্ট্রীটের মুখে সেই ছোট চায়ের দোকান সংলগ্ন 'কাগজের বাঘ' থাকতো সদামুখর, ভাইব্রেন্ট, আভাগার্দ ডিসকোর্সে উথালপাথাল। সেখানে আসতেন তখনকার তো বটেই এখনকারও কেষ্টবিষ্টু বুদ্ধিজীবির দল। হাসিঠাট্টায়, ঝগড়াবিবাদে সমন্বয়সাধনের কাজটি করতো কিন্তু নেশা। কখনও আমরা বায়ুভুক কখনও বা তরল পথেই নির্বাণ। তার জন্য বদনাম যেমন শুনতে হয়েছে তেমনি শুনেছি ... যাঁরা নেশা করতেন না কিন্তু ওই আড্ডায় আসতেন, যাঁরা সংখ্যায় কম নয়, প্রায় চল্লিশ শতাংশ ...তাঁরা অনেকেই বলতেন, 'কি হল তোমাদের 'পানহাওয়া' শুরু হল না এখনও! তবে আড্ডা জমবে কি করে...'

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে নেশা মানুষকে ইনহিবিশন মুক্ত করে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও করে, আর করে বলেই আড্ডাবাজরা হয়ে ওঠেন স্বাধীন, নান্দনিক, মুক্তকচ্ছ। অনাবিল এক আড্ডামগ্নতায় তাঁরা যেন ফুটে উঠতেন। রাত যখন পার হত আড্ডা যেন দুধ মেরে ক্ষীর, ক্ষীর মেরে খোয়া। প্রসঙ্গত বলি, সে আড্ডায় অনায়াস উপস্থিতিতে মহিলারাও তক্কো জুড়তেন, গান গাইতেন, নেশা কখনও তার অন্তরায় হয়নি। আসলে এই নেশাখোর আড্ডাবাজরা চিরকালীন আন্তরিক আর প্রেমিক আর আত্মহারা একক-এক গুণীমানুষ। হয়তো ডিগ্রিধারী নন, বিখ্যাত নন, সামাজিক স্বীকৃতি নেই, তবু তাঁরা অনন্য। অসাধারণ তাঁদের বাগ্মিতা। তারুণ্য-আদৃত ছন্দে ষাট বছরের তরুণ গল্পকার বাসুদেব দাশগুপ্তকে দেখেছি বেহিসেবি জীবনের সুর-লয়ে নিজেকে ভসিয়ে দিতে। হাঙরি জেনারেশনের এই লেখক আউট অফ নাথিং গল্প বানাতেন। তাঁর কথনভঙ্গীতে ছিল এক প্রখর দক্ষতা। আড্ডা জমে গেলে কুড়ি-পঁচিশ থেকে তিরিশ জনে গিয়ে ঠেকতো। কিন্তু একই আড্ডা, একই বিষয, একই আধার। আড্ডায় যেন খই ফুটছে। কত শত নবীন স্বপ্নের মুকুলগুলি ক্রমে জেগে উঠছে।

বাবু-বাঙালিয়ানায় নেশা যেমন আড্ডাবাজিকে সংক্রামিত করেছে তেমন আড্ডার তেপান্তরে নেশা নানাভাবেই ক্রিয়াশীল থেকেছে। কিন্তু আমাদের তখন উৎসাহ ছিল নেশাকে কেন্দ্র করে যে বিস্ময়, যে আনন্দ, যেভাবে সৃষ্টি আর নির্মাণের মেলবন্ধন তাঁর মধ্যেই খুঁজে চলা, হারিয়ে যাওয়া। গিরিশ থেকে মানিক, বড়ুয়াসাহেব থেকে ঋত্বিক, রামকিঙ্কর থেকে কমলকুমার ভায়া সমর সেন তখন সত্যিই আমাদের আপালচারিতায়, আমাদের ভাবনার নীল আকশে ছায়া ফেলেছিল। আমরা শুধু বিভোর ছিলাম তাই নয়, বন্দুকগলি থেকে খালাসিটোলা - বারদুয়ারি - গড়চরা ঠেক, কলেজ স্ট্রিট থেকে ডেকার্স লেন আর টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর চা - খানা— সর্বত্র একদল উদ্যোগী মানুষ লিখে যাচ্ছেন, কাগজ করছেন, থিয়েটার করছেন, ছবি আঁকছেন আর সিনেমার উদ্যোগে প্রাণপাত করেছেন। সামাজিকভাবে এই চেহারাটা হয়ত সব সময়ই ছিল বা আছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি— সে সময় এত স্পিড ছিল না, খামোখা এত দৌড়ে বেড়াতে হত না। তখনও কিছু নির্দিষ্ট নীতি ছিল, অন্বেষণ ছিল, আবেগ ছিল, ছিল সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকান্ডও।

কতসব মজার মানুষের সঙ্গে নেশা করার অভিজ্ঞতা আজও বিহ্বল করে। যেমন প্রদীপ আচার্য ছিল আমাদের চিত্রকর বন্ধু। নেশার আড্ডায় প্রদীপ মক কথা বলত কিন্তু ওর উপস্থিতিটা অদ্ভুত কায়দায় কায়েম রাখত। একবার মনে আছে একসঙ্গে খালাসিটোলায় মদ্যপান-সহ আড্ডা হচ্ছে। প্রদীপ ভাল খেয়ে নিয়েছে। সবাই মনে করছে এবার ওঠা দরকার। কিন্তু প্রদীপকে যাই-ই বলা হয় প্রদীপ বলে 'মিউ'। একেবারে বিড়ালের ভঙ্গীতে মিঁউ। ওকে টানা রিক্সা করে কলেজ স্ট্রিট অবধি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার। রিক্সার পাদানি থেকে সে কিছুতেই উঠে বসবে না। যাই বলি, বলে 'মিঁউ'। অবশেষে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে আমি রিকসায় বসে আর প্রদীপ পাদানিতে 'মিঁউ' সহযোগে গন্তব্যে পৌঁছই।

সেই রাতে প্রদীপ আমাকে এক অধ্যাপিকার বাড়ি নিয়ে যায়। তখন ওখানেই থাকতো। ওর আঁকা প্রভৃতি ছবি নিয়ে আড্ডা দিই ভোর রাত অবধি। আমার নানান প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল সেদিন প্রদীপ। কিন্তু একমাত্র 'মিউ' প্রসঙ্গে একবারও গেল না।

শুধু বলল, 'মাঝে মাঝে তোমাদের মতো পন্ডিতদের কাছে পোষা বেড়াল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কতো জান তোমরা!' বুঝলাম, আমাদের ইনটেলেকচুয়াল এক্সারসাইজকে প্রদীপ ব্যঙ্গ করেছে। প্রদীপের আরেকটা ঘটনা আজও মনে আছে। আমি তখন অনুগত কলকাত'। নামে একটা ছবি তৈরি করছি। প্রদীপ তার শিল্পনির্দেশক। সারাদিন ধরে মধ্য কলকাতার একটি ফ্ল্যাট সাজানো হচ্ছে। প্রদীপ অত্যন্ত তৎপর। আমায় বলল, 'শুটিং-এ মানে? তোমাকে তো থাকতেই হবে। এতো কিছু বানিয়েছ যদি কোনওটা খারাপ হয় বা খুলে যায়?

যাই হোক শুটিং শুরু হল। ডাক পড়ল প্রদীপের। নেই, কোথাও নেই। বললাম 'সেকি, ও যে থাকবে বলল?' প্যাক-আপের পর খবর

পেলাম আমার গুণধর শিল্পনির্দেশ সেই বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে প্রভূত খেয়ে সেই দুপুর থেকেই ঘুমোচ্ছে। যাই হোক তাকে তোলা হয়, গাড়ি দেওয়া হল বাড়ি ফেরার জন্য, কিন্তু সে তখন যাবে না। বলল, 'পরিচালকের সঙ্গে শুটিং নিয়ে আলোচনা আছে'। বললাম 'বেশ, চলো আমার সঙ্গে।' গাড়িতে উঠেই সে প্রোডাকশন ম্যানেজারকে চোখ টিপে ব্যাগ থেকে বার করল একটি আস্ত বাংলার বোতল। বলল, 'এটা আমার তরফ থেকে, বাকিটা প্রোডাকশন দেবে।' সেই রাতেই আমরা পৌঁছে গেলাম সমুদ্রের ধারে। আর প্রদীপ একটা ডায়রি বার করে পড়ে যেতে থাকল তার অসংখ্য কবিতা। আমার তথাকথিত অর্থে অশিক্ষিত ফিল্ম-টেকনিশিয়ান বন্ধুরা কিন্তু ঠায় বসে শুনে গেল কবিতার পর কবিতা।

আসলে নেশা আর আড্ডা নিয়ে লিখতে গেলে হুড়মুড় করে স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে আসে অদ্ভুত সমস্ত মানুষজন— যাঁদের মধ্যে অসম্ভব সরল - সোজা সাধারণ মানুষ যেমন আছেন, তেমনি বলতে কি, সাধারণত্বের ছোঁয়ায় উঠে আসা অসাধারণ মানুষও আছে। যেমনটি গোয়ালপারিয়া লোকসংগীতশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডে। একটা তথ্যচিত্র তৈরি করার সুবাদে প্রায় বছর পাঁচেক তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে শুরু হল নেশার পর্ব। কোনও উচ্চকিত ভাব নেই। নিজস্ব চালে প্রকৃতির ছন্দে, অন্য জীবনের নেশায় ক্রমে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। ভেবে দেখুন, প্রকান্ড রাজবাড়ি— এটা ছিল রাজাদের সামার রেস্ট হাউস— মাটিয়াবাগ। একটা ছোট্ট হিলকের ওপর প্রাসাদটি। তার চারদিকে নেকলেসের মতো গদাধর বয়ে চলেছে। সমস্ত উঠোন ঝাঁট থেকে নদীর জলে নাওয়াধোয়া, রান্নাবান্না, গুণমুগ্ধদের— সাংবাদিক, রাজনীতিক, আড়কাঠি, মাতাল, প্রশাসনিক স্তরের উচ্চপদস্থ আমলাদের দেখভাল। সময়মত সব কিছুই চলছে নিজের নিয়মে—যাঁর মধ্যমণি, নিয়ন্ত্রক প্রতিমাদি। আড্ডা আর গানের সে এক মহামিলন ক্ষেত্র। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম নেশা সম্পর্কে-দৃষ্ঠি কণ্ঠে তিনি জানিয়েছিলেন— 'কেন? আমাদের মা - ঠাকুমারা খেতেন না? হুঁকা, বিড়ি খেতেন না? আমরা খেলে দোষ! আর মদ তো আমাদের কালচারের অন্তর্গত। তুমি নিচ থেকে আপার আসাম অবধি যাও— মদ তৈরি করা থেকে নানা অনুষ্ঠান তৈরি করে খাওয়া সমস্তটাই আর্ট। হ্যাঁ, আমাদের কালচার'।

এমন অনেকানেক উজাড় করা নেশার মেলাখেলাও দেখেছি পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্তে। মূলত ধান কাটার পর প্রথামতো কোথাও তিনদিন, কোথাও চারদিনের মেলা চলে। দিনরাত একাকার হয়ে যায় ভক্তসমাগমে। আর থাকে অসংখ্য মানুষ যাঁদের কাজ মূলত এই কটা দিন এক পরম আহ্লাদে প্রথা ভেঙে দৈনন্দিনতার একঘেয়ে, উত্তেজনাহীন জীবনটাকে ঝালিয়ে নেওয়া। আশ্রমে-আশ্রমে, আখড়ায়-আখড়ায়, গাছতলায়, মন্ডপে চলছে গান, আড্ডা, তত্ত্বকথা আর নেশা। অহোরাত্র এই খোলামেলায় বা মেলাখেলায় জীবনের এমন সব পাঠ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন লোকশিক্ষা, বলেছেন মাটির শিক্ষা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এক সময় প্রত্যন্তের মেলায় মানুষ বছরের ক-টাদিন যেন এলোমেলো এক জীবনচক্রে মিলিত হয়। আর সেখান থেকে নিয়ে যায় এক বরিষ্ঠ জীবনের আশাবাদ। মেলার আড্ডা, গানের আড্ডা, নেশার আড্ডা যেন তাঁদের উজ্জীবিত করে। বাদবাকি দিনগুলো খেটেখাওয়া মানুষ লড়াইয়ের উপাদানগুলো ঝালিয়ে নিতে, বুঝে নিতে আসে এই মেলায়। মেলা তাদের প্রাণ ভরে দিয়ে দেয় এক অসীম তেজ ও লড়াকু মনোভাব। মনে রাখতে হবে ধর্মাচরণ হয়তো মেলার প্রধান উপজীব্য। তবু ধর্মের খোলসটা ছাড়িয়ে মেলার মধ্যে যদি আর একটি মেলা আপনি খুঁজে পান, যদি প্রকৃত আসনের দিশা পান তবে ওই মুহূর্তগুলি ক্রমে ফুটে উঠতে থাকবে। আজীবনের লোকশিক্ষায় আপনি শিক্ষিত হবেন। নেশা সেখানে সামান্য এক উপকরণ মাত্র। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছিলেন, 'ওই যে ফকিরবাবা দেখচ, ওঁর কাছে দু-দন্ড বসে বোঝার চেষ্টা কর, জানার চেষ্টা কর। যা তোমাকে কোনও ডিগ্রি দিতে পারবে না। স্কুল-কলেজ দিতে পারবে না। ওঁর ওই কল্কেটা অবহেলা কোর না। ওটা আসলে মনোনিবেশের মাধ্যম মাত্র।'

মনে পড়ছে আমরা তখন বাউল-ফকিরচর্চায় মশগুল। একদল ছেলে হইহই করে পৌঁছে গেলাম বাঁকুড়ার নবাসন গ্রামে। সেখানে তখন প্রখ্যাত বাউলগুরু হরিপদ গোস্বামী আশ্রমের মহোৎসবের আয়োজন চলছে। হরি গোঁসাই আমার পরিচিত সাধুদের অন্যতম যাঁর তত্ত্বসাধনা ও অপার সরলতা আমার ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছে অদ্যাবধি। তো সেই গোঁসাই তো আমার জীবনযাপনের প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতেন, জানতেন বলেই অতি সন্তর্পণে অন্যদের এড়িয়ে আমাকে বললেন, 'ওই যে নদীর পারে দেখছ একটা হোগলার ছাওয়া, ওইটা তোমার জন্য। ওখানে তোমরা নেশাসেবা করতে পার।' আমি বেশ অসন্তোষের সুরে বললাম, 'সেকি! আপনার আশ্রমে নেশা করা যায়?' উনি ততোধিক শান্তভাব নিয়ে বললনে, 'তেমন কিছু নয় তবে এই আশ্রমে এমনই রীতি।' আমি যারপরনাই হতাশ বয়ে বললাম, 'আপনি সাধু, আপনি বাউল, আপনি গুরু, আপমি মহাজন অথচ আপনি নেশা করেন না?' দেহতত্ত্বের সহজিয়া এই কবিমহাজন আমাকে অবাক করে বললেন, 'দেখ, নেশা মানে তামাক খাওয়া আর মদ খাওয়া এটা আমি মনে করি না। একটা সময় আমিও তোমাদের মতো কল্কে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, তবে আজ আর ওই নেশায় মন মজে না। এখন আমি প্রেমরসের নেশায় আছি।' সত্তরোর্ধ্ব এই সন্ন্যাসী আমাকে প্রায় বিস্মিত করে আমারই তথাকথিত আর্বান মেটাফিজিকালহ প্রয়োগতন্ত্রে দস্তয়েফস্কির 'নোটশ ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড'-কে আবারও নতুন চিহ্নে, নতুন প্রয়োগে যেন সনাক্ত করলেন। আমি রা কাড়তে পারিনি।

এমনতরো নেশাতন্ত্রে সাতসতেরো গল্পগাছা কখনও শেষ হবে না। আমি তার খন্ডমাত্র ছুঁলাম। মুশকিল হল রক্ষণশীল আমাদের সমাজসংস্থার নেশা থেকে যৌনতা সবই করা চলে, কিন্তু তা নিয়ে গল্প করা চলে না— লেখা তো কোন দূর অস্ত। সেইজন্যই জীবিতদের আড্ডায় ঢুকতে পারলাম না।